# অধ্যায় – ৫

# অলংকার

## প্রাচীন অলংকার : সামাজিক তাৎপর্য

সৌন্দর্যবোধ মানুষের সহজাত। সৌন্দর্য চেতনা মানুষকে অন্যান্য প্রাণীদের থেকে পৃথক করেছে। অলংকার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। আদিম মানুষ ছিলেন শিল্পী। আদিম মানুষ গুহার গাত্রে শিল্পচিহ্ন রেখে গেছেন। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ অলংকার ব্যবহার করে তাঁর রূপসন্ধানী সৌন্দর্য তৃষ্ণার পরিচয় রেখে গেছেন। প্রাচীনকালে মানুষ মূর্তি তৈরি করেছে, গহনা ব্যবহার করেছে। প্রাচীনকালের গহনা ছিল সরল। একালের গহনার মত সূক্ষ্ম কারুকার্য সেখানে ছিল না। মহেন-জো-দারো সভ্যতায় অলংকার রূপে 'মল' এবং 'কর্ণফুল'-এর সন্ধান পাওয়া গেছে। আদিম অলংকার পাথর কিংবা শ্বাপদের দাঁত, নখ, চোয়াল প্রভৃতিকে ছিদ্র করে তৈরি করা হত। পশুর চামড়া বা পশুর লোমের সুতো দিয়ে অলংকার নির্মাণ করা হত। ধাপে ধাপে মানুষ ধাতুর ব্যবহার শিখেছে। ধাতু গলানোর প্রক্রিয়া আয়ত্ত করেছে। অবশেষে ধাতু নির্মিত অলংকার আবিষ্কার করেছে সৌন্দর্য পিপাসু মানুষ। প্রস্তর যুগের পর লোহা কাঁসার যুগেও (Copper or Bronze age) মানুষের অলংকারপ্রিয়তা ও সৌন্দর্যচেতনায় সুরুচির ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ধাতুকে চিত্রিত করে অলংকারে রূপ দেওয়া হতে লাগল। কাঁসা-পিতলের যুগ এবং লৌহ যুগেই অলংকারের আকার, রূপ এবং সৌন্দর্যবোধ দুষ্প্রাপ্য বস্তুকে অলংকারের প্রধান উপাদান রূপে গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে কাঠিন্য, স্থায়িত্ব, দীপ্তি, সৌন্দর্যবোধকে মানুষ মান্যতা দিয়েছে। সোনা-রূপা, হীরে-মণি-মুক্তো-চুনি-পান্না-নীলা ধীরে ধীরে অলংকার রূপে সমাজে মান্যতা পেয়েছে। এমন কি দুই বা ততোধিক উপাদান উপকরণে অলংকার তৈরি হয়েছে। অবশেষে দেশভেদে-সমাজভেদে নারীর অলংকার, পুরুষের অলংকার,শিশুদের অলংকারের পার্থক্য সূচিত হয়েছে। পরিবারে পরিবারে-সমাজে সমাজে ভিন্ন রুচি এবং সংস্কৃতির পার্থক্যের কারণে অলংকারের গঠন-প্রকরণ-রূপ-রীতিতে পার্থক্য স্পষ্ট হয়। এসব সত্ত্বেও অলংকার মানব সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে

সার্বজনীন ঐক্য-স্বীকৃতি লাভ করেছে। দেশভেদে-কালভেদে- সমাজভেদে সৌন্দর্যবৃদ্ধির সহায়করূপে অলংকার মান্যতা পেয়েছে।

মানুষ নিজেকে শুধু সোনা-রূপা-হীরের অলংকারেই অলংকৃত করেন নি। বনজ-লতা-পাতা-ফুলের অলংকারেও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। বিশেষত প্রাচীনকাল থেকে ফুলের অলংকার সৌন্দর্যবৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। সমাজে তা মান্যতা পেয়েছে। কালিদাসের বন নিবাসিনী শকুন্তলা ফুল দিয়েই নিজেকে শোভিত করেছেন। দেব-দেবীর অঙ্গাভরণে ফুল দিয়েই শিল্পীরা তাদের শিল্পরসিক মনের তৃপ্তি খুঁজে পেয়েছেন। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত কুসুমশিল্প নরনারীর অলংকার রূপে ব্যবহৃত হয়ে সৌন্দর্যবৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে।সমগ্র মধ্যযুগের বাংলাদেশ ছিল জাতি-সম্প্রদায় এবং বৃত্তি বিভাজিত। এক এক সম্প্রদায়ের মানুষ এক এক বৃত্তি গ্রহণ করতেন। জাত পাত এবং সংস্কার দীর্ণ আচার সর্বস্ব বাংলাদেশেও লোকজীবন উত্থিত প্রয়োজন অনুসারী শিল্পের জন্ম দিয়েছিল। পল্লি-পরিবেশ নির্ভর প্রতিটি শিল্প ছিল দেশ-কাল অনুসারী সৌন্দর্যের সারাৎসার। ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকার বাংলাদেশের লোকশিল্পকে পুষ্টি দিয়েছিল। বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে থাকত এক একটি পল্লী বা পাড়া। শিল্পীদের শিল্পচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল পল্লী। এভাবেই বংশানুক্রমে কামারপাড়া, কুমোর পাড়া, তাঁতি পাড়ার শিল্পীরা ঐতিহ্যসূত্রে শিল্পের উত্তরাধিকার বহন করেছিল। কুমোরেরা মাটির হাঁড়ি-কলসী তৈরি করতেন। কামারেরা লোহার শিল্প, তাঁতি বুনতেন কাপড়, স্বর্ণকারেরা অলংকার তৈরি করতেন। এক একটি গ্রাম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। গান্ধীজী এমন আদর্শ গ্রাম গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। শিল্পীরা পেতেন মর্যাদা। লোকসমাজ ছিল শিল্পীদের রক্ষাকর্তা। পরিবারের প্রয়োজনীয় শিল্প সামগ্রী যোগান দিতেন লোকশিল্পীরা। যখন শিল্প সামগ্রী অতিরিক্ত হত, তখন তা গ্রামের হাটে বা গঞ্জে বিক্রয়ের জন্য পাঠানো হত।

সমাজে রমণীর অলংকারপ্রিয়তা সর্বজন বিদিত। পণ, সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান, আচার, পুজো পার্বণ এবং রীতিনীতি পালনের জন্যও অলংকারের প্রয়োজন হত। সেকালে ব্রাহ্মণদের কোমরের নিচে সোনার অলংকার পরা নিষেধ ছিল। এছাড়া ব্রাহ্মণেরা সোনার জরি দিয়ে তৈরি জুতা এবং সোনার পাত দিয়ে মোড়া খড়ম ব্যবহার করতে পারতেন না। ব্রাহ্মণদের এসব শিল্পদ্রব্য ব্যবহার করাও নিষেধ ছিল। শিল্পীরা

খরিদ্দারদের  নাম, গ্রাম, পিতা, জাতি, গোত্র প্রভৃতির ঠিকুজি কুষ্ঠি লিপিবদ্ধ রাখতেন। ব্রাহ্মণ পত্নী সোনার জরি দিয়ে তৈরি বেনারসী শাড়ী ব্যবহার করতেন না। সামাজিক স্তর অনুযায়ী গহনার প্রতি আকর্ষণ বিভিন্ন শ্রেণীচরিত্রের মানুষের বিভিন্ন রকমভাবে গড়ে উঠেছিল। বরকর্তা, কন্যাকর্তা,রাজা, অভিজাত, জমিদার এবং বিভিন্ন স্তরের রমণীদের গহনার প্রতি আকর্ষণে বিভিন্ন সামাজিক তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায়। গহনার প্রতি আকর্ষণ সেকালের সামাজিক মানুষের স্বাভাবিকতার অনুসন্ধান, সামাজিক মান এবং অর্থনৈতিক বিষমতার চিত্রশালাই বলতে হবে। মধ্যযুগের অলংকার নির্মাতারা ছিলেন শ্রেণীবিভক্ত সমাজের এক বিশেষ শ্রেণীচরিত্র। প্রধানত স্বর্ণকার সম্প্রদায়। বিশিষ্ট সম্প্রদায় এরা। এরা স্বর্ণশিল্পীরূপে চিহ্নিত। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের নায়িকা খুল্লনা গন্ধ বণিক কন্যা।

## চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লিখিত অলংকারের সামাজিক তাৎপর্য :

"Art is, as we have seen, social in origin it remains and must remain social in function." (১)

মুকুন্দরামের কাব্য মধ্যযুগের নানা লোকশিল্প সম্ভারে টইটুম্বুর। মধ্যযুগের নানা অলংকারের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় আছে কবিকঙ্কণের কাব্যে। কবিকঙ্কণের কাব্যে উল্লিখিত অলংকারের পরিচয় নেওয়া যাক। এক এক যুগ, এক এক বৈশিষ্ট্য নিয়ে ধরা দেয়। মধ্যযুগের সমাজ-পরিবেশ পরিমণ্ডলেই সেই শিল্পগুলির বিশেষত্ব রক্ষিত হয়, আবার নতুন যুগ আসে। তখন অনেক শিল্প অবলুপ্ত হয়, অনেক ক্ষীণ হয়ে আসে। যেগুলি টিকে থাকে সেগুলিতে নতুন শিল্প ঘরানা সম্পৃক্ত হয়।

ক) অঙ্গুরি: আঙুলের অলংকার অঙ্গুরি। অঙ্গুরিকে 'অঙ্গুলীয়' এবং 'উর্মিকা'ও বলা হয়। প্রাচীনকালে অঙ্গুরিতে বিষনাশক মণি থাকত। ১৩২৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'প্রাচীন শিল্প পরিচয়' গ্রন্থে গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ লিখেছেন-

"দুষ্মন্ত-প্রদত্ত অঙ্গুলি মুদ্রা হারাইয়াই শকুন্তলাকে অশেষ দুঃখ অনুভব করিতে হইয়াছিল। এই শ্রেণীর আংটিতে বিষাপহারক মণিও সন্নিবেশিত হইত, 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকপাঠে এই রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। দাসী কৌমুদিকা শিল্পগৃহ হইতে আনীত

দেবীর নাগচিহ্নিত মুদ্রাযুক্ত অঙ্গুলীয় দেখিতে দেখিতে বকুলাবালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, এবং এই মুদ্রার প্রভাবে বিদুষকের কৃত্রিম বিষবিকার নিবৃত্ত হইয়াছিল"। [২]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লিখিত 'পশ্যতোহর' (পৃ: ৮২) সম্প্রদায় সোনার অলংকার নির্মাণ করেন। এরা 'স্বর্ণকার' নামে অভিহিত। এছাড়া 'মণিবাণ্যা' (পৃ: ৮২) সম্প্রদায়ের লোকশিল্পীরাও এই শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে অঙ্গুরির উল্লেখ এসেছে নিম্নরূপে---[নিম্নোক্ত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া] [৩]

আখেটিক খণ্ড: ১) অঙ্গুরি (পৃ: ২০) ২) অঙ্গুরি (পৃ: ২১) ৩) মাণিক-অঙ্গুরি (পৃ: ৬৪) ৪) অঙ্গুরি (পৃ: ৬৪,২ বার উল্লিখিত) ৫) অঙ্গুরি (পৃ: ৬৬,৪ বার উল্লিখিত) ৬) অঙ্গুরি (পৃ: ৬৭,৮ বার উল্লিখিত)

বণিক খণ্ড: ১) অঙ্গুরি (পৃ: ৯৮) ২) অঙ্গুরি (পৃ: ১২৪) ৩) অঙ্গুরি (পৃ: ১৩২) ৪) অঙ্গুরি (পৃ: ১৫৪) ৫) অঙ্গুরি (পৃ: ১৬১) ৬) কনক অঙ্গুরি (পৃ: ১৮৫) ৭) অঙ্গুরি (পৃ: ২১৩) ৮) অঙ্গুরি (পৃ: ২৩৫) ৯) অঙ্গুরি (পৃ: ২৫৮) ১০) অঙ্গুরি (পৃ: ২৫৯) ১১) অঙ্গুরি (পৃ: ২৬৩) ১২) অঙ্গুরি (পৃ: ২৮৮) ১৩) অঙ্গুরি (পৃ: ২৯১)

অঙ্গুরি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সেকালে বণিক পল্লীতে স্বর্ণকারেরা অঙ্গুরি তৈরি করতেন। ধূর্ত মুরারি শীল এবং তাঁর স্ত্রী বন্যানী কালকেতুকে ঠকাতে চেয়েছে। কালকেতু বলেছে—

"কালকেতু বলে খুড়া না কর ঝগড়া।

অঙ্গুরি লইআ জাব অন্য বণিকের পাড়া"।। [৪]

দেবী চণ্ডীর প্রদত্ত আংটিতে কালকেতুর আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। কালিদাসের সংস্কৃত শকুন্তলা নাটকে শকুন্তলার শোকের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে আংটি হারানোর ঘটনা। বিবাহে আংটি বদল বাঙালি সংস্কৃতির অঙ্গ। Ajit Mookerjee তাঁর, 'Folk art of India' গ্রন্থে লিখেছেন- "India, with a rich cultural heritage, is well known for her deep-rooted folk tradition. To

understand how closely it is integrated with life and how expressive it can be of a way of living, Indian Folk art offers rich and significant forms, which are some of the deepest satisfaction known to man." (৫)

খ) অঙ্গদ (কেয়ুর বা বাজু): কবিকঙ্কণের কাব্যে অঙ্গদের উল্লেখ এসেছে অনেকবার। অঙ্গদ বাহুর উপরের দিকের ব্যবহৃত অলংকার। গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ১৩২৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'প্রাচীন শিল্প পরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন- "কেয়ূর এবং অঙ্গদ, এই উভয়শব্দ বাচ্য অলংকার, বাহুর উর্ধ্বাংশে ব্যবহৃত হইত। বর্তমান কালের বাজু, অনন্ত প্রভৃতি এই স্থানে পরিহিত হয়। কবিপ্রবর বাণভট্ট রাজা শূদ্রকের বাহুশিখর অর্থাৎ বাহুর উর্দ্ধভাগ, কেয়ূরের দ্বারা পরিশোভিত করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান যুগে কেয়ূর বাজু নামে পরিচিত হইতেছে, সেকালের কেয়ূরের সহিত একালের কেয়ূরের কিছুমাত্র জ্ঞাতিত্ব নাই। কারণ, সেকালের কেয়ূর নিগড়-শঙ্কা জন্মাইত, সেই কেয়ূর দেখিয়া লোকে তাহাকে সর্প বলিয়া উৎপ্রেক্ষা করিত, অতএব জিনিসটা যে গোলাকার হইত, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। সুতরাং বর্তমান কালের অনন্তকে কেয়ূরের বংশধর বলা যাইতে পারে"। (৬)

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে অঙ্গদের উল্লেখ হয়েছে বেশি। কেয়ূর এবং বাজুর উল্লেখ মাত্র একবার করে এসেছে। নিম্নলিখিতভাবে কাব্যে 'অঙ্গদ'-এর উল্লেখ এসেছে---- [নিম্নলিখিত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া] (৭.ক)

আখেটিক খণ্ড: ১) অঙ্গদ (পৃ: ১১) ২) অঙ্গদ (পৃ: ৬৭)

বণিক খণ্ড: ১) অঙ্গদ (পৃ: ১০৩) ২) অঙ্গদ (পৃ: ১২৪) ৩) অঙ্গদ (পৃ: ১৩৮) ৪) অঙ্গদ (পৃ: ২১৩) ৫) অঙ্গদ (পৃ: ২৫৮)

গ) বাজু: (বণিক খণ্ড) : মুকুন্দরামের কাব্যে বাজুর উল্লেখ কম- ১) বাজু (পৃ: ১৩৮)। মেয়েদের হাতের অলংকার ছিল বাজু। প্রবালকান্তি হাজরা তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন- "প্রায় এক শতক, বাংলাদেশে মেয়েদের শরীরে খাড়ু-বাজুর গৌরবময় ভূমিকা ছিল। সেকালে মেয়েদের হাতের অলংকার ছিল বাজু বা বাজু বন্ধ। হাতের ডানায় পরতো, প্রায় এক ইঞ্চি চওড়া আকারের অলংকার"। (৭.খ)

ঘ) কেয়ূর: (বণিক খণ্ড): কবির কাব্যে কেয়ূরের উল্লেখও কম- ১) কেয়ূর (পৃ: ১৫৪)। লক্ষণীয় 'অঙ্গদ' দেব-দেবীর অলংকার রূপে ব্যবহৃত। সেকালে অভিজাত মানুষের অলংকার হিসেবেই 'অঙ্গদ' ব্যবহৃত হয়েছে। কাব্যে দেবখণ্ডে 'স্থাপনা' অংশে অঙ্গদের ব্যবহার হয়েছে। অপরপক্ষে কালকেতু যখন দেবীর অনুগ্রহে সম্পদ লাভ করেন, তখন অন্যান্য অলংকার সামগ্রীর সঙ্গে অঙ্গদ কিনেছেন। এছাড়া কাব্যে বণিক খণ্ডে অভিজাত বণিকদের অলংকার রূপে অঙ্গদের ব্যবহার এসেছে। কেয়ূর এবং বাজুও বণিক খণ্ডেই অলংকার রূপে উঠে এসেছে কবির কাব্যে। স্ত্রী-আচার এবং বিবাহে বর-বরণ উপলক্ষ্যে অঙ্গদের ব্যবহার করেছেন কবিকঙ্কণ-

"অঙ্গুরি অঙ্গদ হার ভূষণ চন্দন।

দিয়া লক্ষপতি করে বরের বরণ।।

তবে রম্ভা স্ত্রী-আচার করে যথাবিধি

বরের চরণে পাদ্য ঢালা দিল দধি"। (৮)

জামাতা বরণে মঙ্গল আচারের সঙ্গে যৌতুক স্বরূপ অঙ্গদ দেওয়ার রীতি বাঙালি সমাজে প্রচলিত ছিল।

ঙ) কঙ্কণ: কঙ্কণ হাতের অলংকার। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কঙ্কণের উল্লেখ বেশি। অবশ্য কবিকঙ্কণের কাব্যে তা নয়। মুকুন্দরামের উপাধি কবিকঙ্কণ। ১৩৩৪ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় যোগেশচন্দ্র রায় তাঁর 'গহনা' প্রবন্ধে লিখেছেন- "বোধ হয় দামিন্যার কবি মুকুন্দরামকে আশ্রয়দাতা আড়ড়ার রাজা কবিত্বের সম্মানস্বরূপ কঙ্কণ দিয়াছিলেন। এই হেতু তাঁহার উপাধি কবিকঙ্কণ"। (৯)

কঙ্কণকে করভূষণও বলা হয়। হিন্দু রমণীরা অলংকার রূপে কঙ্কণ ধারণের সময়ে স্ত্রী-আচার মেনে চলেন। কবিকঙ্কণের কাব্যে কঙ্কণের উল্লেখ এসেছে নিম্নরূপে-

[নিম্নলিখিত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া] (১০)

আখেটিক খণ্ড: ১) কঙ্কণ (পৃ: ৬৪) ২) কঙ্কণ (পৃ: ৬৭)

বণিক খণ্ড: ১) কঙ্কণ (পৃ: ১০৩) ২) কঙ্কণ (পৃ: ১১০) ৩) কঙ্কণ (পৃ: ১৩৮) ৪) কঙ্কণ (পৃ: ১৬৬) ৫) কঙ্কণ (পৃ: ২৯১)

অনার্য সমাজে কঙ্কণের ব্যবহার কম। আখেটিক খণ্ডে দেবদেবীর অলংকার রূপে কঙ্কণের ব্যবহার পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া কালকেতু দেবীর কৃপায় সম্পদ লাভ করে অন্যান্য অলংকারের সঙ্গে কিনেছেন কঙ্কণ। অর্থনীতি সংস্কৃতির চালিকাশক্তি, শীলিত হওয়ার সোপান। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"নম্রমান মুতিআর অঙ্গদ কঙ্কণ হার

কিনে বীর কনক সাঁপুড়া"। (১১)

বণিক খণ্ডে সেকালের অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষেরাই কঙ্কণের সাহায্যে দেহ সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন।

চ) কুণ্ডল: কর্ণাভরণের মধ্যে কুণ্ডলই প্রধান। মধ্যযুগের সাহিত্যে কর্ণের আভরণ রূপে কুণ্ডলের ব্যবহার বেশি। কুণ্ডল কানের নিম্ন অংশে ব্যবহার করা হয়। কুণ্ডল সোনার তৈরি। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে শঙ্খের কুণ্ডলের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে।

বাল্মীকি রামায়ণে উল্লিখিত আছে রামচন্দ্র ব্রাহ্মণ ও তপস্বীদের ধনরত্ন এবং অলংকার দান করছেন। মহাকবি বাল্মীকি লিখেছেন-

"জাতরূপময়ৈর্মুখ্যৈরঙ্গদৈঃ কুণ্ডলৈঃ শুভৈঃ।

সহেমসূত্রৈর্মণিভিঃ কেয়ূরৈর্বলয়ৈরপি।। ৫

হারঞ্চহেমসূত্রঞ্চ ভার্য্যায়ৈ সৌম্য হারয়।

রশনাঞ্চাথ সা সীতা দাতুমিচ্ছতি তে সখী।। ৭

অঙ্গদানি চ চিত্রাণি কেয়ূরাণি শুভানি চ।

প্রযচ্ছতি সখে তুভ্যং ভার্য্যায়ৈ গচ্ছতী বনম্।। ৮ (১২)

বশিষ্ঠপুত্র সুযজ্ঞকে স্বর্ণময় শ্রেষ্ঠ অঙ্গদ, মনোহর কুণ্ডল, হেমসূত্রে (বক্ষস্থলের আভরণ) মণিমালা, কেয়ূর, বলয় এবং অনেক রত্ন অলংকার দিয়ে পূজা করলেন। সীতাদেবী বনবাস যাত্রাকালে সুযজ্ঞের পত্নীকে হার, হেমসূত্র, কাঞ্চীদাম, বিচিত্র অঙ্গদ, মনোহর কেয়ূর প্রভৃতি অলংকার দান করলেন। বাল্মীকি অঙ্গদে 'বিচিত্র' বিশেষণ এবং 'কেয়ূরে' শুভ বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় তাঁর "গহনা" প্রবন্ধে লিখেছেন- "আমাদের দেশে কুণ্ডল পুরস্কার দিয়া পাণ্ডিত্যের সম্মান করা হইত"। (১৩)

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কুণ্ডলের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে নিম্নলিখিত রূপে-

[নিম্নলিখিত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া] (১৪)

আখেটিক খণ্ড: ১) কুণ্ডল (পৃ: ২) ২) কুণ্ডল (পৃ: ২৫) ৩) কুণ্ডল (পৃ: ১৬৬)

বণিক খণ্ড: ১) শঙ্খের কুণ্ডল (পৃ: ১০২) ২) রত্নের কুণ্ডল (পৃ: ২৭৪ -২বার উল্লিখিত ৩) কুণ্ডল (পৃ: ২৭৬)

দেবাদিদেব মহেশ্বরের অলংকার রূপে শঙ্খের কুণ্ডলের উল্লেখ এসেছে কাব্যে। কবি লিখেছেন-

"পিঠে লম্বমান তাঁর শোভে জটাভার
শঙ্খের কুণ্ডল কানে ভীষণ আকার"। (১৫)

কুণ্ডলের উজ্জ্বলতা যেন বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ। কবি লিখেছেন-

"রত্নের কুণ্ডল কানে করে ঝলমলি।
রাকাসুধাকর মাঝে পড়িছে বিজুলি"।। (১৬)

বাংলার শিল্প-সৌন্দর্য এবং অলংকারিক সৌন্দর্য সম্পর্কে ভারতবর্ষে আগত প্রথম পর্বে ইংরেজদের ধারণা ভাল ছিল না। কবিকঙ্কণের কাব্য রচনার সমসাময়িক কালে ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত রচনায় John Fryer ভারতীয় নারীর অলংকার প্রসঙ্গে উন্নাসিক ধারণারই পরিচয় দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন- "In their (women) Ear's Mock Jewels (Jewels); about their Necks and wrists trifling Bracelets of

beads, glass, or wire of Brass, about the small Brass chains and on their Fingers Rings of the same matal." [১৭]

ভারতীয় শিল্পকলার গভীরতা তখন ইংরেজরা অনুভব করতে পারেন নি। পরবর্তীকালে ইউরোপীয় শিল্পরসিকেরা ভারতীয় শিল্পের যথার্থ স্বরূপ গভীরভাবে আত্মস্থ করেছিলেন।

বাল্মীকি রামায়ণে দেখা যাচ্ছে, লঙ্কাপুরীর অন্তঃপুর রমণীরা কানের শেষ প্রান্তে পরতেন হিরন্ময় কুণ্ডল। এই কুণ্ডল হীরক এবং বৈদূর্যমণি খচিত থাকত। এই কুণ্ডল আকাশের চাঁদের মত, আকাশের নক্ষত্রের মত রমণীর মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য প্রকাশ করত। মহাকবি বাল্মীকি লিখেছেন-

"বজ্রবৈদূর্য্যগর্ভাণি শ্রবণান্তেষু যোযিতাম্।

দদর্শ তপনীয়ানি কুণ্ডলান্যঙ্গদানি চ।। ৩৩।।

তাসাং চন্দ্রোপমৈর্বক্ত্রৈঃ শুভললিতকুন্ডলৈঃ।

বিরাজিত বিমানং তৎ নভস্তারাগণৈরিব"। ।।৩৪।। [১৮]

ছ) চুড়ি: কবিকঙ্কণের কাব্যে চুড়ির ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কবির কাব্যে উল্লিখিত চুড়ি সোনার। কেবল একটি ক্ষেত্রে কলধৌত চুড়ির কথা বলেছেন। কাব্যে চুড়ির উল্লেখ এসেছে নিম্নরূপে- [নিম্নলিখিত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া] [১৯]

আখেটিক খণ্ড: ১) স্বর্ণচুড়ি (পৃ: ৬৮)

বণিক খণ্ড: ১) সোনার চুড়ি (পৃ: ১১০) ২) কনকের চুড়ি (পৃ: ১৬২) ৩) কলধৌত চুড়ি (পৃ: ১৩৮)

'প্রাচীন শিল্প পরিচয়' গ্রন্থে গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ লিখেছেন- "শেষ যুগের সাহিত্যে শঙ্খবলয়ের মধ্যবর্তী চুড়ির ব্যবহার দেখা যায়। কবিকঙ্কণ কালকেতুকে গোলাহাটে জিনিস কিনিতে পাঠাইয়া, তথা হইতে অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে গৃহিণীর জন্য

সোনার চুড়িও ক্রয় করিয়াছেন। যথা-'হীরা নীলা মোতি পলা কলধৌত কণ্ঠমালা, কুণ্ডল কিনিল স্বর্ণচুড়ি'। কবিকঙ্কণের উক্তিতে কুলপিয়া অর্থাৎ খিল দেওয়া শঙ্খের উল্লেখ দেখা যায়। ইহাতে বোধ হয়, তাহার সময় কুলপিয়া শঙ্খ ধারণ জাঁক-জমকের পরিচয় ছিল"। (২০)

কবিকঙ্কণের কাব্যে বণিক খণ্ডে স্বর্গের রত্নমালা নৃত্য করছেন। দেবতারা দেখে সাধুবাদ দিচ্ছেন। নানা অলংকার পরেছেন রত্নমালা। পরেছেন সোনার চুড়ি। যেন বিদ্যুতের আলো ঠিকরে পড়ছে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"কনকের গড়ি চুড়ি  পরি দিব্য পাট সাড়ি

দু করে কুলপি সাজে শঙ্খ"। (২১)

রত্নমালার নৃত্যের মত লোকশিল্প স্বতঃস্ফূর্ত। চুড়ির ঝঙ্কারের মত সহজাত। দিনক্ষণ মেপে মানুষের রূপসন্ধানী চিত্ত সৌন্দর্য পিপাসু হয় না। স্বর্ণ কামারেরা কবে প্রথম চুড়ি তৈরি করেছিল আমরা জানি না। লোকশিল্প মানুষের সহজাত সৌন্দর্য সত্তার বহিঃপ্রকাশ। Jane Ellen Harrison তাঁর 'Ancient Art and Ritual' গ্রন্থে যথার্থই লিখেছেন-"All Great Art releases from self." (২২)

জ) পাসলি: পাসলি পায়ের অলংকার। সোনা বা রূপার তৈরি পায়ের গহনা হল পাসুলি। অনার্য অলংকাররূপে বোধ হয় পাসুলির তেমন ব্যবহার ছিল না। আখেটিক খণ্ডে পাসুলির ব্যবহার পাওয়া যায় না। বণিক খণ্ডেই পাসুলির উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। কবিকঙ্কণের কাব্যে নিম্নলিখিতভাবে পাসুলির উল্লেখ এসেছে- [নিম্নলিখিত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া] (২৩)

বণিক খণ্ড: ১) পাসুলি (পৃ: ১১০) ২) পাসুলি (পৃ: ১৩২) ৩) পাসুলি (পৃ: ১৩৮) ৪) পাসুলি (পৃ: ১৬১) ৫) পাসুলি (পৃ: ১৬২) ৬) পাসুলি (পৃ: ২৬৩)

কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"অঙ্গুরি পাসুলি ছটি সুবর্ণ রগড়ি কাঁঠি

মণি মুতি পলা হেম হার"। (২৪)

কিংবা-

‘রত্নময় অঙ্গুরি  সকল অঙ্গুরি ভরি

পদাঙ্গুলে পাসুলি রতন’। [২৫]

দেবী চণ্ডী অলংকার পরেছেন। পায়ের আঙুলে পরেছেন পাসুলি। বোঝা যাচ্ছে, মার্জিত এই অলংকার আর্য রমণীরাই ব্যবহার করতেন।

ঋগ্বেদ সংহিতায় বক্ষস্থলের অলংকার রূপে যেমন হার উল্লিখিত হয়েছে, ঠিক তেমনি পায়ের অলংকার রূপে কটকের উল্লেখ আছে। মাথার উপরে সোনার উষ্ণীষের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদ সংহিতার ৫ম মণ্ডলের ৫৪ সূক্তে বলা হয়েছে-

“অংসেষু ব ঋষ্টয়ঃ পৎসু খাদয়ো বক্ষঃসু

রুক্মা মরুতো বথে শুভঃ

অগ্নিভ্রাজসো বিদ্যুতো গভস্ত্যোঃ শিপ্রাঃ শীর্ষসু

বিততা হিরণ্যয়ী”।।  ১১।। [২৬]

এসব অলংকার মানব শরীরকে প্রদীপ্ত বিদ্যুতের মত শোভা দেয়। George C.M. Birdwood 1880 খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর সুবিখ্যাত ‘The Arts of India’ গ্রন্থে লিখেছেন- “The Jeweller’s and goldsmith’s art in India is indeed of the highest antiquity, and the forms of Indian jewellery as well as of gold and silver plate, and the chasings them, have come down in an unbroken tradition from the Ramayana and Mahabharata. The first light of Aryan civilisation dawned in the Ganges valley, and spread thence into the valley of the Tigris and the Euphrates.” [২৭]

.ঝ) নূপুর: পায়ের অলংকার রূপে মধ্যযুগের সাহিত্যে নূপুরের উল্লেখ অনেক। পায়ের অলংকার আকারগত এবং অর্থগত বিশেষত্ব অনুসারে নানা নামে চিহ্নিত হলেও নূপুরই বিশেষভাবে পরিচিত। গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ তাঁর ‘প্রাচীন শিল্প পরিচয়’ গ্রন্থে লিখেছেন-

"সাহিত্যে নূপুরের অভাব নাই, কিন্তু কি উপাদানে নূপুর নির্মিত হইত তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না"। [২৮]

নূপুর মণিবন্ধন সহযোগে নির্মিত হয়। কবিকঙ্কণের কাব্যে নিম্নলিখিতভাবে নূপুর এসেছে- [নিম্নলিখিত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া] [২৯]

আখেটিক খণ্ড: ১) নূপুর (পৃ: ১) ২) নূপুর (পৃ: ৬) ৩) নূপুর (পৃ: ২১) ৪) মঞ্জীর (নূপুর,পৃ: ২৩) ৫) নূপুর (পৃ: ৫৫) ৬) নূপুর (পৃ: ৮৮) ৭) নূপুর (পৃ: ৮৯)

বণিক খণ্ড: ১) নূপুর (পৃ: ১১০) ২) মঞ্জীর (নূপুর,পৃ: ১১২) ৩) নূপুর (পৃ: ১৩৮) ৪) নূপুর (পৃ: ১৬২) ৫) নূপুর (পৃ: ১৭০) ৬) নূপুর (পৃ: ১৭৫) ৭) নূপুর (পৃ: ২০৬) ৮) নূপুর (পৃ: ২১২) ৯) নূপুর (পৃ: ২১৯) ১০) নূপুর (পৃ: ৪৩৪) ১১) মল (পৃ: ২৬৫) ১২) নূপুর (পৃ: ২৯৬) ১৩) নূপুর (পৃ: ৩০০)

নর্তকী রত্নমালা স্বর্গে নৃত্য করছেন। দেবতারা নৃত্য উপভোগ করছেন। কবি লিখেছেন-

"ভুবনমোহন কাছে ধুপদ তাণ্ডব নাচে

গান মুনি রাধার বিষাদ

মুখর নুপূরশালি দেন ঘন করতালি

দেবগণ বলে সাধুবাদ"। [৩০]

নূপুর যেমন অলংকার, তেমনি লোকবাদ্যও। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

'চরণ-পঙ্কজরাজে কনক নূপুর বাজে' [৩১]

কবিকঙ্কণ অভয়ার চরণে কাঞ্চন নুপুর পরিয়েছেন। মনে হয়, আর্য রমণীরা প্রাচীনকাল থেকেই নূপুর পরতেন। সৌন্দর্য নির্মাণে কবির অক্লান্ত চেষ্টা। কবিকঙ্কণের কাব্য বিচিত্র অলংকারে টইটুম্বুর।

ঞ) বলয়: কালিদাস মেঘদূত কাব্যে লিখেছেন-

'নীত্বা মাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ' (৩২)

যক্ষ প্রিয়াবিরহে শীর্ণ হয়েছেন। তার হাত থেকে খসে গেছে সোনার বলয়। কনুই থেকে মণিবন্ধ পর্যন্ত হাত হল প্রকোষ্ঠ। বলয় কনুয়ের নিম্নদেশে ধারণীয় অলংকার। কবিকঙ্কণের কাব্যে দেবীর অলংকার রূপে স্বর্ণবলয়ের উল্লেখ আছে -

'অঙ্গদ বলয়া বিভূষণ' (৩৩)

দেবী মহামায়ার অলংকার কবির কাব্যে এসেছে এভাবে-

'অঙ্গদা বলয়া শঙ্খভুবনে উপমা রঙ্ক

মণিময় মুকুট মণ্ডন'। (৩৪)

নিয়ন আলোর উজ্জ্বলতায় শিশির শিক্ত শিউলী ফুলের সুবাস গন্ধে ভরপুর কবির সেই যুগ-পরিবেশ গেছে হারিয়ে। সেকালের সেই অলংকার বলয়কে সেভাবে আর ফিরে পাওয়া যাবে না কখনোই। কাব্যের বিভিন্ন অংশে মুকুন্দরাম দেবী চণ্ডীকে নানা আভরণে অলংকৃত করেছেন। কবির কাব্য প্রয়োজন এবং সৌন্দর্যের উচ্চতম সীমা স্পর্শ করেছে।

ট) বালা- বালা নারী-পুরুষ উভয়েরই অলংকার ছিল। যোগেশচন্দ্র রায় তাঁর 'গহনা' প্রবন্ধে লিখেছেন-

"বীরত্বের পুরস্কার বালা ছিল"। (৩৫)

সেকালে বালকের হাতেও থাকত বালা। পরবর্তীকালে বালা নারীর অলংকার রূপেই বেশি পরিচিত। কবিকঙ্কণের কাব্যে বালার উল্লেখ থাকলেও 'তাড়বালা', 'হেমতাড়' বালা নামের অলংকারের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। কবির কাব্যে বালার উল্লেখ এসেছে নিম্নলিখিতভাবে-

আখেটিক খণ্ড : ১) তাড়বালা (পৃ: ৮৪)

বণিক খণ্ড : ১) তাড়বালা (পৃ: ১২৪) ২) হেমতাড়বালা (পৃ: ১৭৪) ৩) তাড়বালা (পৃ: ২০৯) ৪) বালা (পৃ: ২১৩) ৫) বালা (পৃ: ২৫৮) ।

[উপরিউক্ত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া][৩৬]

বিবাহ বাসরে ধনপতি দত্তের অলংকার ধারণ বর্ণনা করেছেন কবিকঙ্কণ-

"মুকুট শিরে রোপে কুমকুম অঙ্গে লেপে

দু-করে হেমতাড়বালা"। [৩৭]

মুকুন্দরামের কাব্যে বালা পুরুষের অলংকার রূপেই ব্যবহৃত হয়েছে।

অলংকার শিল্প কোন সমাজ ও সভ্যতার উচ্চতর শৈল্পিক এবং নান্দনিক ভাবনার প্রতিফলন ব্যক্ত করে। 'Concise Encyclopedia of The Arts' গ্রন্থে Theodore Rowland Entwistle লিখেছেন- "As civilizations developed, jewellery came increasingly sophisticated, [...] Jewellery reflects the tastes and artistic standards of society." [৩৮]

ঠ) <u>হার:</u> হারাবলী-তরল-কাঞ্চন-কাঞ্চিদাম-

মঞ্জীর-কঙ্কণমণি-দ্যুতিদীপিতস্য"। [৩৯]

কৃষ্ণের মণিহারের প্রভায় আলোকিত গৃহদ্বার। অলংকার পরিহিত কৃষ্ণকে দেখেছেন শ্রীরাধিকা। সংস্কৃত সাহিত্য তো বটেই, সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য হারের বর্ণনায় টইটুম্বর। গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ তাঁর 'প্রাচীন শিল্প পরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন-

"সাহিত্যে যত প্রকার আভরণের পরিচয় পাওয়া যায়, তন্মধ্যে হারের মত শ্রেণীবিভাগ আর কুত্রাপি প্রায় পরিলক্ষিত হয় না। এই হার সাধারণত মুক্তার দ্বারা নির্মিত হইত; সেইজন্য হারের অপর নাম মুক্তাবলী"।[৪০]

মুকুন্দরামের কাব্যে হার এবং মুক্তোমালা ছাড়াও সতেশ্বরী হারের উল্লেখ আছে। গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ তাঁর 'প্রাচীন শিল্প পরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন-

"হারের লহরগুলির নাম যষ্ঠি, লতা, সর ও সরি। লহরের সংখ্যানুসারে হারের বিশেষ নাম দেখা যায়। শতলহর হার 'দেবচ্ছন্দক' নামে অভিহিত। [...] অর্বাচীন সাহিত্যেও 'দেবচ্ছন্দক হার' শতেশ্বরী নামে অভিহিত হইয়াছে। [৪১]

কবিকঙ্কণের কাব্যে হারের উল্লেখ এসেছে নিম্নরূপে-

আখেটিক খণ্ড : ১) মণিময় হার (পৃ: ২) ২) হার (পৃ: ৬) ৩) হার (পৃ ৪) হার (পৃ: ৬৭) ৫) 'নম্রমান মুতিআর' হার (পৃ: ৬৭) ৬) হীরা, মুক্তা, পলা, নির্মিত কণ্ঠমালা (পৃ: ৬৮)।

বণিক খণ্ড : ১) হার (পৃ: ১০৩) ২) হার (পৃ: ১২৪) ৩) মণিময় হার (পৃ: ১৫৫) ৪) হার (পৃ: ১৬০) ৫) হেমহার (পৃ: ১৬১) ৬) হেমহার (পৃ: ১৬৪) ৭) কনক কুন্তলহার (পৃ: ১৭৫) ৮) কণ্ঠহার (পৃ: ১৭৬) ৯) হার (পৃ: ৩০০) ১০) কনকহার (পৃ: ১৯৩) ১১) মণিময় হার (পৃ: ২৭৯) ১২) মণিময় হার (পৃ: ৩০২)

সতেশ্বরী হার- (বণিক খণ্ড): ১) 'সতেশ্বরি' হার (পৃ: ১১২) ২) 'শতেশ্বরী' হার (পৃ: ২৩৪)। এছাড়া – ১) হীরা-নীলা এবং পলার কণ্ঠমালা (পৃ: ১১০)

২) 'হিরা-নীলা-মুক্তো-পলার মালা' (পৃ: ১৬২)

৩) মুকুতার মালা (পৃ: ২৫১)

৪) 'গজমুতি' হার (পৃ: ৫৯)

৫) 'নম্রমান মুতিআর' (পৃ: ৬৭)

[উপরিউক্ত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যপঞ্জীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া] [৪২]

কবিকঙ্কণ খুল্লনার রূপের বর্ণনায় সতেশ্বরি হারের উল্লেখ করেছেন-

"গলে সতেশ্বরি হার শোভে নানা অলংকার

করে শঙ্খ শোভে তাড়বালা"। [৪৩]

ঋগ্বেদ সংহিতায় বক্ষস্থলের সুবর্ণ- আভরণের উল্লেখ আছে। বক্ষস্থলের আভরণ এবং পদের আভরণের দীপ্তি শোভা পাচ্ছে। ঋগ্বেদ সংহিতার ৫ম মণ্ডলের ৫৩সূক্তে

উল্লিখিত আছে- 'যে অংজিযু যে বাশীষ স্বভানবঃ স্রক্ষু রুক্মেষু খাদিষু। শ্রায়া বথেষু ধন্বসু'। (৪৪)

ড) শিকলী – শিকলী কটি বা কোমরের অলংকার বিশেষ বা গোট। কবিকঙ্কণের কাব্যে কনকশিকলী বা সোনার শিকলীর উল্লেখ আছে। কটি্তে শিকলী ছাড়াও কিঙ্কিণীর ব্যবহার হয়। শিকলী রমণীর অলংকার। অবশ্য কবিকঙ্কণের কাব্যে শিশুদের অলংকার রূপে শিকলীর ব্যবহার এসেছে। বণিক ধনপতি দত্তের এক বৎসরের শিশুপুত্র শ্রীমন্তের অলংকার রূপে শিকলীর উল্লেখ আছে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"কটিতটে লম্বমান কনক শিকলী

মলবাঁকি পদযুগে করে ঝলমলী"। (৪৫)

শিশু শ্রীমন্ত নৃত্য করেছেন। ঠিক যেন বৃন্দাবনে চিরকিশোর কৃষ্ণের নৃত্য। কোমরে সোনার শিকলী। শিকলী মধ্যযুগের অলংকার। এক হারিয়ে যাওয়া সময় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে কবিকঙ্কণের লেখনীতে।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে অন্যান্য যে অলংকারগুলি উল্লিখিত হয়েছে সেগুলি নিম্নরূপ-

❖ ১) কুশাঙ্গুরি- (পৃ: ১০২) : বণিক খণ্ড : কুশ (তৃণ) নির্মিত অঙ্গুরি- দেবী অভয়া যখন ভৈরবী মূর্তিতে শ্মশানে গমন করেন, তখন এই অঙ্গুরি ধারণ করেন।

'অঙ্গুলেতে আরোপিলা কেশ কুশাঙ্গুরি' (৪৬)

❖ ২) গাঠ্যা (সোনার গাঠ্যা, পৃ: ১৫৯) : বণিক খণ্ড : দুর্বলা দাসী সওদাগর ধনপতি দত্তকে খাসী উপঢৌকন দিয়ে নিজের সম্মান স্বরূপ সোনার 'গাঠ্যা' নিয়েছেন।

"দুইটা সোনার গাঠ্যা পাইল ইনাম" (৪৭)

❖৩) ঝাঁপা (পৃ: ১৬১) : বণিক খণ্ড : ধনপতি দত্তের শয়নকক্ষে খুল্লনার অলংকারকে নির্দেশ করেছেন কবিকঙ্কণ -'নেয়াল করিআ আট- প্রথমে বিছায় খাট/তুলি মুসরি সেজি ঝাঁপা' (৪৮)

❖ ৪) তুলাকোটি (হাত বা পায়ের অলংকার, পৃ: ১৬২) : বণিক খণ্ড : তুলাকোটি বাহুর অলংকার বিশেষ। সৌন্দর্যপ্রিয় লহনা পরেছেন তুলাকোটি-

'রজত পাসুলি ছটী
পরে দিব্য তুলাকোটি
বাহু বিভূষণ ঝলমলি'। (৪৯)

❖ ৫) পদক (পৃ: ১৩৮) : বণিক খণ্ড : পদক গলার অলংকার। খুল্লনা পরতেন পদক। লহনা ধনপতি দত্তের অবর্তমানে সপত্নী খুল্লনার থেকে গলার পদক খুলে নিয়েছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

'ললাটিকা নিল সিঁথি গলার পদক'। (৫০)

❖ ৬) নম্রমান সোনা (পৃ: ৮৭, কানের অলংকার): আখেটিক খণ্ড: গুজরাত নগর যেন কৃষ্ণের জন্মভূমি মথুরা। প্রতি সন্ধ্যাকালে শঙ্খ ঘণ্টা বাজে। আশ্রম চত্বরে গুণীজন আসে। তারা অলংকার পরেন নম্রমান সোনা। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

'কানে নম্রমান সোনা
বদনে কর্পূর সনে পান' (৫১)

❖ ৭) পিত্তল ভূষণ (পিতলের অলংকার, পৃ: ১৯২): বণিক খণ্ড : - কবিকঙ্কণের কাব্যে পিত্তল ভূষণের উল্লেখ আছে। পিত্তল ভূষণ কেমন অলংকার তা আজ আর বোঝার উপায় নেই। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

'শঙ্খ পরিবার তরে  রামাগণ সাদ করে
পিত্তল ভূষণ ঘরে ঘরে'। (৫২)

❖ ৮) বউলি (কর্ণাভরণ, পৃ: ১৩২): বণিকখণ্ড: লহনা স্বামীকে বশ করার জন্য ঔষধ সংগ্রহ করতে চায়। দুর্বলা দাসীকে লীলাবতীর কাছে পাঠাতে চায়। দুর্বলা এই কাজের জন্য উপহার স্বরূপ পেয়েছেন বউলি। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

'হিরায় জড়িত নিল কনক বউলি'। (৫৩)

❖ ৯) বউলি (কর্ণাভরণ, পৃ: ১৫৪): বণিকখণ্ড: খুল্লনাও কানের অলংকার রূপে পরেছেন সোনার বউলি, তা যেন সৌন্দর্যের ছটা। জলভরা মেঘ থেকে যেন বিদ্যুৎ ঝরে পড়ছে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

'সজল জলদে জেন পড়িছে বিজুলি'। [৫৪]

❖ ১০) ললাটিকা (পৃ: ১৩৮) : বণিকখণ্ড: নির্মম, নিষ্ঠুর লহনা খুল্লনার গলার এবং কপালের অলংকার খুলে নিয়েছেন। মুকুন্দরাম লিখেছেন-

'ললাটিকা নিল সিঁথি গলার পদক'।

বাঙালি রমণী নানা বিচিত্র অলংকারে শোভিত। কবিরা নারী সৌন্দর্যকে নানা প্রসাধনকলার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'প্রাচ্য প্রসাধনকলা' প্রবন্ধে লিখেছেন- "আমাদের প্রমদাগণের চিত্র যেন তাহাদের বিচিত্র প্রসাধনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সন্নিবদ্ধ। দুইখানি প্রকোষ্ঠ সন্নদ্ধ বলয় কঙ্কণ এবং কণ্ঠবিলম্বিত চারু হারলতাটি, এমন কি, নূপুরের নিক্কনটুকু পর্য্যন্ত আমাদের অন্তরের কুলকন্যাগণের রমণীয় মূর্তির সহিত একান্ত বিজড়িত"।[৫৫]

মধ্যযুগের অলংকার এত পরিশীলিত ছিল না। প্রবালকান্তি হাজরা তাঁর "গ্রামীণ জীবনরাগের ঝিলিক" গ্রন্থে লিখেছেন- " তখন ছিল সেকেলে গয়নার চল- খাড়ু-বাজু-মল-গোট-পৈঁছা প্রভৃতির যুগ। এসব অলংকার ছিল যথেষ্ট ভারি ওজনের,[.....] এককালে এসব অলংকার সারা বাংলাদেশেই চালু ছিল। ক্রমে ক্রমে গত পাঁচ – সাত দশকের আগে, এগুলি গ্রাম-শহরের রমণীদের দেহ থেকে হারিয়ে গিয়েছে। একালে কদাচিত সে সবের দেখা মেলে। কিন্তু ষাটোর্ধ ব্যক্তি মাত্রেরই স্মৃতিতে বাজু-খাড়ুর ছবি অটুট।[৫৬]

রত্ন ও মণি - প্রাচীনকাল থেকে ধর্ম ভারতীয় জীবন ধারার সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত। রত্ন শোভা-সৌন্দর্যের শুধু দ্যোতনা দেয় না, রত্ন সম্পদ বলে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশে তন্ত্র, জ্যোতিষ, চিকিৎসায় রত্ন ব্যবহার হয়েছে প্রাচীনকাল থেকে। ধর্মপ্রাণ বাঙালি, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র শাসিত এই দেশে রত্নের উপরে পৌরাণিক মহিমা, অলৌকিকতা ও দেববাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পুরাণ মতে উল্লেখযোগ্য রত্ন নয়টি- বজ্র, পুষ্পরাগ, মাণিক্য, ইন্দ্রনীল, বৈদূর্য, মুক্তা, প্রবাল প্রভৃতি। এছাড়া নীল, পদ্মরাগ, গোমেদ, স্ফটিক, মরকত প্রভৃতিকে মুখ্য রত্ন বলে মনে করেছেন প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা। নবরত্নকে মহারত্ন বলে মনে করা হয়। গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ তাঁর "প্রাচীন শিল্প পরিচয়" গ্রন্থে রত্ন এবং মণি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন রত্নের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে রত্নকে

শিল্প বলেই অভিহিত করেছেন। প্রস্তর পরিমার্জনা এবং পরিশীলিত করেই রত্নের সৃষ্টি বলে তিনি মনে করেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন- "স্বতন্ত্রপ্রজ্ঞ মনীষিগণ বলেন- পৃথিবীর স্বভাববশতই প্রস্তরের বৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে,-

রত্নানি বলা দ্দৈত্যাদ্দধীচিতোহন্যে বদন্তি জাতানি
কেচিদভুবঃ স্বভাবা দ্বৈচিত্র্যং, প্রাহুরূপলানাম।

সুতরাং প্রস্তর বিশেষই রত্ন নামে অভিহিত হয়। [৫৭]

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্যে রত্ন এবং মণির উল্লেখ এসেছে নানা স্থানে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'বন্দনা' অংশে কৌস্তভ মণিরত্নের উল্লেখ এসেছে। পুরাণ মতে, সমুদ্র মন্থনের সময়ে সমুদ্রের তলদেশ থেকে এই মণি উঠেছিল। ভগবান বিষ্ণু এই মণি বক্ষে ধারণ করেছিলেন। 'সৃষ্টি পালা আরম্ভ' অংশে কবি লিখেছেন-

'কণ্ঠে কৌস্তভ আভা কোটি চাঁদ নখ শোভা
কুণ্ডলে মণ্ডিত দুই গণ্ড'। [৫৮]

'গৌরীর অধিবাস' অংশে মণি এবং মুক্তার উল্লেখ এসেছে। গৌরীর বিবাহ মঙ্গল উৎসব। কবিকঙ্কণ লিখেছেন – 'মুকুতায় মণি বান্দা/টানাইল পাট চাঁদা/চৌদিগে জালেন দীপমালা'।[৫৯] আখেটিক খণ্ডে কালকেতুও হীরা এবং মুক্তো জড়ানো চূড়া কিনেছেন- 'মাজাকুড়া হিরায় জড়িত/চন্দন তরুর পিড়া/লম্বিত মুকুতা চূড়া'। [৬০] আবার কালকেতু ফুল্লরার জন্য কিনেছেন – 'হিরা নিলা মুতি পলা/ কলধৌত কণ্ঠমালা। [৬১] বণিকখণ্ডে মুক্তার মালার উল্লেখ করেছেন কবি।

ধনপতি সিংহল দেশে বাণিজ্য যাত্রা করেছেন। এক প্রজন্ম পরে শ্রীমন্ত ও বাণিজ্য যাত্রা করেছেন। সমুদ্রে দেখেছেন কমলে কামিনী। কবিকঙ্কণ লিখেছেন- 'বেনন পাটের থোপ মুকুতার মাল'।[৬২] ভোজের 'যুক্তিকল্পতরু' গ্রন্থে শঙ্খকেও রত্ন বলে বলা হয়েছে। - 'সৌগন্ধিকং , তথাগঞ্জং শঙ্খং ব্রহ্মময়স্তথা।[৬৩]

কবিকঙ্কণের কাব্যে রত্ন হিসাবে মুক্তার উল্লেখ বেশি। মুক্তা সৌভাগ্য বহন করে। 'প্রাচীন শিল্প পরিচয়' গ্রন্থে 'গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ' লিখেছেন- "শুক্তিজাত মুক্তাই সর্বশ্রেষ্ঠ"।[৬৪]

ঝারা/ঝারি - মুকুন্দরামের কাব্যে একটি বিশেষ অলংকারের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তা হল ঝারা বা ঝারি। ঝারা বা ঝারি শব্দটির প্রতি মুকুন্দরামের বিশেষ পক্ষপাত আছে। কবি কাব্যের নানা স্থানে এই শব্দদ্বয়ের উল্লেখ করেছেন। কাঁসারিরা 'ঝারি' নির্মাণ করেন। হরগৌরীর বিবাহ উৎসব। হিমালয় সানন্দে গৌরীকে শিবের হাতে সমর্পণ করছেন। আর কন্যা দান হিসাবে দিয়েছেন-"ঝারি থালা ধেনু শয্যা দিল নানা দান"।[৬৫] কাঁসারিরা ঝারি তৈরি করেন। গুজরাট নগর পত্তনে অন্যান্য শিল্পী সম্প্রদায়ের সঙ্গে এসেছেন কাঁসারিরা। মুকুন্দরাম লিখেছেন-

"কাঁসারি পাতিআ শাল ঝারি খুরি গড়ে থাল

বাটী ঘটী বট-লই শিপ"।[৬৬]

কিংবা -

রথ তুরঙ্গম দোলা, সকল্বাথ ঝারি থালা।[৬৭]

আবার, ঝারি এক প্রকার অলংকার। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

'চন্দন-চৌখুরি দিল ঝারি কণ্ঠমালা'।[৬৮]

কালকেতুর সম্পদ লাভে ভাঁড়ুর ঈর্ষা জন্মেছে। তিনি কলিঙ্গ রাজকে গিয়ে নানা কুমন্ত্রণা দিয়েছেন। কালকেতু সম্পর্কে ভাঁড়ু বলেছেন-

"পূর্বে পিত ভাণ্ডে বারি এবে তার হেমঝারি

ঘটী বাটী সব হেমময়"।[৬৯]

অবশেষে কালকেতু রাজা হয়েছেন। পরেছেন সুর্বণের অলংকার। গলায় পরেছেন ঝারি কণ্ঠমালা। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"গজ তুরঙ্গম রথ দিল বর দোলা।

চন্দন চৌখুরি দিল ঝারি কণ্ঠমালা"। [৭০]

বণিক খণ্ডে নায়িকা খুল্লনা চণ্ডীপূজার জন্য দেওয়ালে আলপনা এঁকেছেন। এঁকেছেন অষ্টদল পদ্ম। আর পূজার আয়োজন করেছেন তিনি একরকম-

"উপরে ফুল-ঝারা  মাঝেতে হেমবারা

করিল নানা আয়োজনে"।(৭১)

খুল্লনার শুভবিবাহেও এরকম ফুলের ঝারার মণ্ডপ স্থাপন করতে ভোলেন নি কবিকঙ্কণ। কবি লিখেছেন-

"উপরে ফুলের ঝারা  স্থাপিল গনেশ-বারা

দ্বিজগণ করে বেদ গান"।(৭২)

খুল্লনা নানা অলংকারে নিজেকে সজ্জিত করেছেন। ডানহাতে পরেছেন 'রজতের ঝারি'। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

'ডানি করে নিল রামা রজতের ঝারি'।(৭৩)

ফুল্লরা এবং ধনপতি দত্তের শয়ন মন্দির। বাসরঘরে অবস্থান করেছেন নবদম্পতি। দীপের আলোকে উজ্জ্বল করে বাসরঘর। নানাভাবে সজ্জিত এমন বাসরঘর। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"ধবল চামর বান্ধা  উপরে টানায় চান্দা

প্রতিচালে মুকুতার ঝারা"।(৭৪)

খুল্লনার পাশাপাশি লহনাও অলংকার পরেছেন। ডান হাতে পারছেন 'হেমঝারি'। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"নানা অলঙ্কার পরি  ডানি করে হেমঝারি

বামকরে তাম্বুল সাঁপুড়া"।(৭৫)

বণিকবধূ ফুল্লরা পুত্রলাভের জন্য স্নান করছেন। যজ্ঞ করছেন। যজ্ঞের মণ্ডপে টাঙানো হয়েছে চাঁদোয়া। উপরি অংশে ঝোলান হয়েছে ফুলঝারা। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"যজ্ঞের মণ্ডপে টানাঞি চন্দ্রাতপে

চৌখুরি পুরিয়া চন্দনে।

"আরোপি হেমবারা উপরে ফুলঝারা

বসাইল কনক-আসনে"।[৭৬]

সেকালে জ্ঞাতি-বন্ধু এবং ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ করে বিভিন্ন অন্ন-ব্যঞ্জনের দ্বারা আপ্যায়ন করা হত। সম্মান স্বরূপ ব্রাহ্মণ ঋষিদের নানা উপঢৌকন দেওয়া হত। খুল্লনা ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে ব্রাহ্মণদের আপ্যায়ন করিয়েছেন । তাম্বুল দিয়ে মুখ শোধনের পর সম্মান স্বরূপ ব্রাহ্মণ ঋষিদের উপঢৌকন দেওয়া হয়েছে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"হব্যঋষি পাইল মান সায়বানি দোলা

চন্দন চৌখুরি দিল ঝারি কণ্ঠ মালা

কৌসিখি পাইল মান সুবর্ণের ঝারি

সাত গাঁয়ের বাণ্যা পাইল বিচিত্র পামরি"।[৭৭]

ধনপতি দত্তের দোলা প্রস্তুত হয়েছে। সে দোলা শোভিত নানা অলংকারে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"উপরে ছাউনি দিল পাটের পাছড়া

চারিদিকে শোভে গজমুকুতার ঝারা"।[৭৮]

স্বর্ণকারেরা হেমঝারি, ফুলঝারা প্রভৃতি অলংকার তৈরি করেন। সোনার তালে শিল্পীর লাবণ্য মিশিয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন স্বর্ণ কামারেরা। রমণীর লাবণ্য মনোহর স্নিগ্ধ শোভনতা দেয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'লাবণ্যযোজনা' প্রবন্ধে লিখেছেন- "মুক্তার রূপের ভঙ্গি নিষ্প্রভ, যদি না তাহাতে লাবণ্যের দীপ্তি থাকে।[...] লাবণ্য পাথরকে নিজের

সুনির্দিষ্ট রেখাটি দিয়া অঙ্কিত করিতেছেন,[...] লাবণ্য নিজে শুদ্ধা এবং সংযতা। সুতরাং যাহাকেই স্পর্শ করেন তাহাকেই বিশুদ্ধি দেন। সংযম দেন"।(৭৯)

চাঙ্গড়া:- এক থাবা দ্রব্যকে বলা হয় 'চাঙ্গ'। সোনার পিণ্ড সদৃশ দ্রব্য হল চাঙ্গড়া। কবিকঙ্কণের কাব্যে 'সুবর্ণ চাঙ্গড়ার' উল্লেখ আছে। খুল্লনা শ্রীমন্তকে সিংহলে বাণিজ্য যাত্রার অনুমতি দিয়েছেন। শ্রীমন্তের সাত ডিঙ্গার দাম শত পল সুবর্ণ চাঙ্গড়ার সমান। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

ক) 'ফিরাইলে শত পল সুবর্ণ-চাঙ্গড়া'। (৮০)

খ) 'শত পল সুবর্ণ-চাঙ্গড়া তার মান'। (৮১)

গ) 'ধরিলেন শ্রীমন্তের সুবর্ণ-চাঙ্গড়া'। (৮২)

বোঝা যায়, মধ্যযুগে 'চাঙ্গড়া' গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবান স্বর্ণ নির্মিত দ্রব্য ছিল। কিন্তু এই অলংকারের স্বরূপ কেমন ছিল, তার পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় না।

## মধ্যযুগে ব্যবহৃত রমণীদের অলংকার: আর্য-অনার্য অলংকার-সামাজিক স্তর বৈষম্য:

"The whole life was conceived as an art and lived as an art." (৮৩)

সমগ্র মধ্যযুগে বাংলাদেশ ছিল জাতি-সম্প্রদায় এবং বৃত্তি বিভাজিত। এক এক সম্প্রদায়ের মানুষ এক এক বৃত্তি গ্রহণ করতেন। বৃত্তি-সম্প্রদায় এবং শিল্প ছিল সমার্থক। এসব সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের চোখ রাঙানি ও অনুশাসনকে উপেক্ষা করে লোকজীবন স্ফূর্তি লাভ করেছিল। সংহত লোকসমাজের প্রাণবন্ত জীবনীশক্তিকে অবরুদ্ধ করা সম্ভব ছিল না ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রতিনিধিদের। জাত-পাত এবং সংস্কার-দীর্ণ আচার সর্বস্ব বাংলাদেশেও লোকজীবন উত্থিত প্রাণশক্তি প্রয়োজন অনুসারী শিল্পের জন্ম দিয়েছিল। পল্লি-পরিবেশ নির্ভর প্রতিটি শিল্পই ছিল দেশ-কাল অনুসারী সৌন্দর্যের সারাৎসার।

মধ্যযুগের অলংকার নির্মাতারা ছিলেন শ্রেণীবিভক্ত সমাজের এক বিশেষ শ্রেণীচরিত্র। প্রধানত স্বর্ণকার সম্প্রদায়। জাতি বিভক্ত বাংলাদেশের পাড়া-পল্লীর বিশিষ্ট সম্প্রদায়। সময়ের সিঁড়ি বেয়ে বহু যুগের ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকারের সাধনাকে অধিগত করে সংহত সমাজে তারা শিল্পী। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেখা যাচ্ছে, গন্ধ বণিক-কন্যা খুল্লনা-

"খুল্লনা হইব খ্যাতি  হব গন্ধবান্যা জাতি

বিবাহ করিব ধনপতি"। (৮৪)

H.H. Risley তাঁর 'The Tribes and Castes of Bengal' গ্রন্থে লিখেছেন-"Baniya, Banik, Barnik, Banikar, a generic name, derived from Sank. Vanij, 'a merchant', applied to almost all of the trading castes throughout India. In Bengal Baniya is not, strictly speaking, a caste name at all; [.....] It a man trades in money rather than in commodities, he is commonly know by the more dignified title of Mahajan or Banker. One of the Variants of the word is used colloquially in Bengal as a synomym for Gandha banik, a dealer in medicinal drugs and spices." (৮৫)

স্বর্ণকারেরা অলংকার প্রস্তুত করেন। এরা হলেন স্বর্ণবণিক। কবিকঙ্কণের কাব্যে বেনের মেয়ে হলেন খুল্লনা। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ধূর্ত মুরারী শীলের পরিচয় দিয়েছেন কবি। মুরারী শীল বণিক, স্বর্ণ বণিক। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"শুন গো শুন গো খুড়ি  কিছু কার্য আছে ডেড়ি

অঙ্গুরি ভাঙ্গাইয়া লব কড়ি"। (৮৬)

কিংবা -

"লেখা-জোখা করে টাকা কড়ি"। (৮৭)

এভাবেই ধনতান্ত্রিক সমাজের উৎসমুখ প্রকটিত হয়েছিল। মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে অসম অর্থনৈতিক কাঠামোর লেখচিত্র অঙ্কন করেছেন কবি। এক শ্রেণীর অর্থলোভী, স্বর্ণলতা শ্রেণীর মানুষের জন্ম হয়েছিল। মধ্যযুগের কৃষিভিত্তিক সমাজ কাঠামোর মধ্যে অন্যান্য বৃত্তিজীবী ব্রাত্য সম্প্রদায় থেকে দূরত্ব তৈরি করেছিলেন স্বর্ণকার বণিক সম্প্রদায়। অনার্য কালকেতু এবং ফুল্লরার প্রতি একধরনের উন্নাসিকতাও পোষণ করতেন এরা। বণিক মুরারী শীল এবং তাঁর পত্নী বন্যানী একই ছাঁচে গড়া। কৃষি সমাজের মধ্যে থেকেও এমন পৃথক শ্রেণী চরিত্রের বৃত্তিজীবী সম্প্রদায় মধ্যযুগের সমাজ বাস্তবতায় অন্যতর অনুসন্ধানের ইঙ্গিত দেয়।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সামাজিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে রমণীর স্তর বিভাজন স্পষ্ট। কিন্তু অলংকার ধারণের ক্ষেত্রে মধ্যযুগের দেশ-কাল-পরিবেশে সৃষ্ট অলংকারগুলিই রমণীর সৌন্দর্য সৃষ্টির সহায়ক। কবিকঙ্কণের কাব্যে অনার্য রমণী ফুল্লরা যেমন আছেন, তেমন আর্য রমণীদ্বয় লহনা এবং খুল্লনার রূপ সৌন্দর্যের সন্ধান করেছেন কবি। এছাড়া কাব্যে দেবীর অলংকারেরও উল্লেখ আছে। সর্বোপরি, কবির সৌন্দর্য সৃষ্টি-প্রতিভার চরমতা প্রদর্শিত হয়েছে স্বর্গ-নর্তকী রত্নমালার অলংকার সজ্জায়। শ্রেণীবিভক্ত নারী চরিত্র-অনার্য-অনভিজাত এবং আর্য-অভিজাত দুই পৃথক ধারায় বিভক্ত। কালকেতু অর্থলাভ করেছেন। ফুল্লরার জন্য তিনি অলংকার কিনেছেন-

"পুরিতে জায়ার সাদ  কিনিল পাটের জাদ

মণি-মুকুতা তাহে বেড়ি

হিরা নিলা মুতি পলা  কলধৌত কণ্ঠমালা

কুণ্ডল কিনিল স্বর্ণচূড়ি"। [৮৮]

প্রাপ্ত অর্থ আর্থ সামাজিক জীবনের মানচিত্রকে বদলে দিয়েছে। যে ফুল্লরা পরতেন 'হরিণের ছড়', সেই তিনি পরবেন 'কলধৌত কণ্ঠমালা'। আর কবিকঙ্কণ দেবী সরস্বতীর অলংকারের বর্ণনা দিয়েছেন এরকম-

"শ্বেত পদ্মে অধিষ্ঠান  শুক্ল ধুতি পরিধান

কণ্ঠে শোভে মণিময় হার

শ্রবণে কুণ্ডল দোলে  কপালে বিজুলি লোলে

তনুরুচি খণ্ডে অন্ধকার"। [৮৯]

বণিকখণ্ডে কবিকঙ্কণ খুল্লনাকে সাধু ধনপতি দত্তের সামনে নিয়ে গেছেন সোনার কেয়ূর, অঙ্গদ, কঙ্কণ এবং হার পরিয়ে। খুল্লনা পরেছেন তসরের শাড়ি, কবরী বেঁধেছেন 'কুসুমের গাভা' দিয়ে।

কিশোরী বেলায় খুল্লনা গলায় পরেছেন সতেশ্বরি হার-

"গলে সতেশ্বরি হার  শোভে নানা অলংকার

করে শঙ্খ শোভে তাড়বালা

চরণে মঞ্জীর বাজে  স্বর্গবিদ্যাধরী সাজে

যৌবন বাড়ায় দিনে দিনে"। [৯০]

অবশেষে সপত্নী বিদ্বেষে লহনা ধনপতির অবর্তমানে খুল্লনার অলংকারগুলি খুলে নিয়েছে-

"বলে নিল শিরোমতি কানের কনক

ললাটিকা নিল সিঁথি গলার পদক।

বাজুবন্ধ নিল হেম পায়ের পাসুলি

অঙ্গদ কঙ্কণ নিল দিআ গালাগালি।

.....

কিঙ্কিণি লইল তার বাজন-নুপুর

শঙ্খ ভাঙ্গ্যা লয় হেম-মানিকের গড়ি

.....

শতেশ্বরী হার নিল কলধৌত চুড়ি"। (৯১)

ধনপতি শয়ন মন্দিরে প্রেমের স্মারক উপহার দিয়েছেন খুল্লনাকে-

"অঙ্গুরি পাসলি ছটি  সুবর্ণ রগড়ি কাঁঠি

মণি মুতি পলা হেম হার"। (৯২)

সেই রমণী খুল্লনা নানা অলংকারে ভূষিতা, 'পাটের জাদ' পরিহিতা। কবরী বাঁধেন 'মালতী-মল্লিকা চাঁপা গাভা' দিয়ে, কর্ণাভরণ কুণ্ডলিকা, এছাড়া পাসুলি, তুলাকোটি, সোনার চুড়ি, শঙ্খ আর হীরা-নীলা, মুক্তো, পলার কণ্ঠমালা- এমন কুঞ্জরগামিনী খুল্লনা নূপুর পায়ে চলেন-

"সুনাদ নূপুর পায়  কুঞ্জর গামিনী জায়" (৯৩)

লহনাও পরেছেন কাজল, বেঁধেছেন কবরী, পরেছেন মেঘ-ডম্বুর শাড়ী, কাঁচুলি এঁটে বয়স কমিয়ে ফেলেছেন তিনি। তিনিও মণিময় হার পরে স্বামী সম্ভাষণে চলেছেন।

## ফুল্লরা-লহনা-খুল্লনার ব্যবহৃত অলংকার- শিল্প সৌন্দর্যের সমন্বয়ঃ

সৌন্দর্য অশেষ। তার কোন সীমা নেই, সংজ্ঞা নেই। স্বর্গ নর্তকী রত্নমালার সৌন্দর্য বর্ণনায় কবিকঙ্কণের কবিত্বের চরম স্ফূর্তি ঘটেছে-

"মুখর নূপুরশালি  দেন ঘন করতালি

দেবগণ বলে সাধুবাদ।

কনকের গড়ি চুড়ি  পরি দিব্য পাটসাড়ি

দু করে কুলপি সাজে শঙ্খ

হিরা নীলা মুতি পলা  কলধৌত কণ্ঠমালা

কলেবরে মলয়জ পঙ্ক।

পীত তড়িত বর্ণে  হেম মুকুলিকা কর্ণে

কেশ-মেঘে পড়িছে বিজুলি

রজত পাসলি ছটি  পরে দিব্য তুলাকাঠি

বাহুবিভুষণ ঝলমলি"। [৯৪]

অলংকার মধ্যযুগের সাহিত্যে বিশেষ জায়গা নিয়েছে। মানুষ-ই সৌন্দর্য সাধনা করে। সৌন্দর্য-চর্চা এক তপস্যা, সংযমও বটে। প্রয়োজন অনুসারী শিল্পের স্রষ্টারা হলেন ব্রাত্য মানুষ। মানুষ মানুষ হয়েছেন তার সৌন্দর্যবোধের জন্য। অলংকার মানুষের সৌন্দর্যচেতনাকে প্রসারিত করে। কাব্যে আর্য-অনার্য অলংকারের স্তর বিন্যাস স্পষ্টরূপে চিহ্নিত করেছেন কবিকঙ্কণ। দেখা যাচ্ছে, ফুল্লরা-লহনা-খুল্লনার ব্যবহৃত অলংকার চমৎকার শিল্প সৌন্দর্যের দ্যোতনা এনে দিয়েছে সমগ্র কাব্যে।

কবিকঙ্কণের কাব্যে অলংকারের ব্যবহার কবির কাব্যবোধকে অসাধারণ উচ্চতায় নিয়ে গেছে। Jane Ellen Harrison তাঁর 'Ancient Art and Ritual' গ্রন্থে লিখেছেন- "Art does usually cause Pleasure, singular and intense, and to that which causes such pleasure we give the name of Beauty." [৯৫]

একই বৃত্তির মানুষ বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় শিল্পের অনুষঙ্গে সম্পৃক্ত থাকত। R.V. Russell এই বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন তাঁর "The Tribes and castes of the central provinces of India, volume I"-গ্রন্থে- "Many sub castes are also formed slight differences of occupation, which are not of sufficient importance to create new castes. Some instances of sub castes formed from growing

special plants or crops have been given. Audhia Sunars (goldsmiths) work in brass and bell-metal, which is less respectable than the sacred metal, gold." [৯৬]

# তথ্যসূত্র


১. Harrison, Jane Ellen (LL.D, D.Litt), Ancient art and Ritual, London, Williams and Norgate, Henry Holt and Co., New York, 1913, Chapter-VII (Ritual, art and life), P. -240

২. বেদান্ততীর্থ, গিরীশচন্দ্র, প্রাচীন শিল্প পরিচয় (ভূমিকা-অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়) কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, সুবর্ণরেখা, ১৪২৫, পৃঃ ৭১

৩. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লী, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩

৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৬

৫. Mokhorjee, Ajit, Folk art of India, India library, Clarion Books, New Delhi- 1986, Introduction, P.14

৬. বেদান্ততীর্থ, গিরীশচন্দ্র, প্রাচীন শিল্প পরিচয় (ভূমিকা-অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়),কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, সুবর্ণরেখা, ১৪২৫, পৃ: ৭২

৭. (ক) চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লী, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩

৭ (খ) হাজরা, প্রবালকান্তি, গ্রামীণ জীবনারাগের ঝিলিক, প্রভা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১, পৃ: ২০০- ২০১

৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৪

৯. রায়, শ্রীযোগেশচন্দ্র, গহনা (প্রবন্ধ), প্রবাসী, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৩৪, সম্পাদক-রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৭৩

১০. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লী, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩

১১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৭

১২. বাল্মীকি, শ্রী মন্মহর্ষি, রামায়ণম্ঃ (অযোধ্যাকাণ্ড), সম্পাদক-শ্রী পঞ্চানন তর্করত্ন, বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরী, কলকাতা, মে ২০১২, পৃঃ ২২১

১৩. রায়, শ্রীযোগেশচন্দ্র, গহনা (প্রবন্ধ), প্রবাসী, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৩৪, সম্পাদক-রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৭৩

১৪. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লী, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩

১৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩২

১৬. পূর্বোক্ত ,পৃঃ ২৭৪

১৭. Fryer John, A New Account of East India and Persia in Eight letters, London, Printed by R.R. for Paul's Church – Yard – MDCXC VIII, Begun, 1672 and finished 1681, Chapter – 11, PP. 20-21

১৮. বাল্মীকি শ্রীমম্মহর্ষি, রামায়ণমঃ (অযোধ্যাকাণ্ড),সম্পাদক – শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন, বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরী, কলকাতা, মে – ২০১২, পৃঃ ৭৩৫

১৯. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লী, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩

২০. বেদান্ততীর্থ, গিরীশচন্দ্র, প্রাচীন শিল্প পরিচয় (ভূমিকা – অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়), কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, সুবর্ণরেখা, ১৪২৫, পৃঃ ৭৪

২১. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লী, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃঃ ১১০

২২. Harrison, Jane Ellen (LL.D., D. Litt), Ancient Art and Ritual, (Ritual, art and life, Chapter – VII), London, Williams and Morgate Henry Holt and Co., New York, 1913, P. 242

২৩. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লী, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩

২৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬১

২৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬৩

২৬. দত্ত, রমেশচন্দ্র (সংকলিত), পাল, নিমাইচন্দ্র (সম্পাদিত), ঋগ্বেদ সংহিতা (মূল), ৫ম মণ্ডল, ৫৪ সূক্ত, সদেশ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৭, পৃঃ ৩১০

২৭. Birdwood, George C.M., The Arts of India, C.S.I.M.D. Edin, British Book Company, 3rd Edition – 1986, La Motte Street, Jersey, CI, UK, P. – 186

২৮. বেদান্ততীর্থ গিরীশচন্দ্র, প্রাচীন শিল্প পরিচয় (ভূমিকা – অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়), কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, সুবর্ণরেখা, ১৪২৫, পৃঃ ৭১

২৯. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লী, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩

৩০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১০

৩১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১

৩২. কালিদাস, মেঘদূত, বসু, রাজশেখর (সম্পাদিত), এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ – ১৪১১, পৃঃ ২

৩৩. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লী, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃঃ ১

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭

৩৫. রায়, শ্রীযোগেশচন্দ্র, গহনা (প্রবন্ধ), প্রবাসী, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৩৪, সম্পাদক – রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৭৩

৩৬. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লী, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৪

৩৮. Entwistle Theodore Rowland (Editor), The Jeweler's Art : Concise Encyclopedia of the Arts, Purnell Books 1979, Autumn Publishings Ltd., 10 Eastgate square Chichester, Sussex. PP. – 208-209

৩৯. জয়দেব, গীতগোবিন্দ, একাদশ সর্গঃ, পৃঃ ২৫৩, সম্পাদক – হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আশ্বিন, ১৪২৪

৪০. বেদান্ততীর্থ, গিরীশচন্দ্র, প্রাচীন শিল্প পরিচয় (ভূমিকা – অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়), কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, সুবর্ণরেখা, ১৪২৫, পৃঃ ৬৭

৪১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৭-৬৮

৪২. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লী, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১২

৪৪. দত্ত, রমেশচন্দ্র (সংকলিত), পাল, নিমাইচন্দ্র (সম্পাদিত), ঋগ্বেদ সংহিতা (মূল), ৫ম মণ্ডল, ৫৪ সূক্ত ।। ৪।।, সদেশ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৭, পৃঃ ৩১০

৪৫. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লী, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃঃ ২১৯

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০২

৪৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৯

৪৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬১

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬২

৫০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৮

৫১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৭

৫২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯২

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩২

৫৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৪

৫৪. (ক) পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৮

৫৫. ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ, প্রাচ্য প্রসাধনকলা (প্রবন্ধ), বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, সম্পাদক – ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাশ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, পৃঃ ৪১৮

৫৬. হাজরা, প্রবালকান্তি, গ্রামীণ জীবনরাগের ঝিলিক, প্রভা প্রকাশনী, কলকাতা, এপ্রিল – ২০১১, পৃঃ ২০০

৫৭. বেদান্ততীর্থ, গিরীশচন্দ্র, প্রাচীন শিল্প পরিচয় (ভূমিকা – অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়), কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, সুবর্ণরেখা, ১৪২৫, পৃঃ ৭৫

৫৮. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লী, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩,পৃঃ ৬

৫৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০

৬০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৭

৬১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৮

৬২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫১

৬৩. বেদান্ততীর্থ, গিরীশচন্দ্র, প্রাচীন শিল্প পরিচয় (ভূমিকা – অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়), কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, সুবর্ণরেখা, ১৪২৫, পৃঃ ৭৭

৬৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮০

৬৫. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লী, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩,পৃঃ ২২

৬৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮২

৬৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৩

৬৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৩

৬৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৬

৭০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৩

৭১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৭

৭২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২২

৭৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৪

৭৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬১

৭৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬২

৭৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৪

৭৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯১

৭৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫৩

৭৯. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, লাবণ্যযোজনা (প্রবন্ধ), অবনীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড, প্রকাশ ভবন, ফেব্রুয়ারী – ২০১৮, কলকাতা, পৃঃ ২০৭-২০৮

৮০. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লী, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩,পৃঃ ২২৯

৮১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৯

৮২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৯

৮৩. Dutta, Gurusaday, Folk Arts and Crafts of Bengal, The collected papers, page – 19 'বাংলার লোক শিল্প' – প্রদ্যোত ঘোষ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৪, পৃঃ ১৯ - গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

৮৪. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লী, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩,পৃঃ ২৮

৮৫. Risley, H.H., The Tribes and Castes of Bengal., Printed at the Bengal Secretarial press, Calcutta 1892, Ethnographic Glossary, Vol.1., P. – 58

৮৬. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লী, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩,পৃঃ ৬৬

৮৭. পূর্বোক্ত পৃঃ ৪৬

৮৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৮

৮৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২

৯০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১২

৯১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৮

৯২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬১

৯৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬২

৯৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১০

৯৫. Harrison Jane Ellen (LL.D., D.Litt), Ancient Art and Ritual, Chapter : Ritual, Art and Life, London, Williams and Norgate, Henry Holt and Co., New York, 1913, P. – 211

৯৬. Russell, R.V., The Tribes and Castes of the Central Provinces of India, Volume – 1, CPSIA information can be obtained at wwwJCGtesting.com, printed in USA BVHWOIS 0803231018